ষষ্ঠ অধ্যায় ‖ ঔচিত্যবাদ

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ঔচিত্য সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে এবং কাব্যের জগতে ঔচিত্যের গুরুত্বই বা কতটুকু সেই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের আগে সহজভাবে ঔচিত্য বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক্ কোনো ব্যক্তি একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তাঁরই এক বন্ধুর বাড়ি গেছেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তির উচিত অনুচিতের বোধটুকু থাকলে তা নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশিত হবে। যদি দেখা যায় ঐ শোকানুষ্ঠানে তিনি খুব রঙচঙে জেল্লাদার জামাকাপড় পরে ও উৎকট সাজে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ঔচিত্যবোধের অভাব আছে। কারণ শোকানুষ্ঠানে যে কোনো রঙ বর্জনীয়। শান্তির রঙ সাদা, আর দুঃখশোকের রঙ কালো। তাই যে কোনো শোকানুষ্ঠানে ঐ রঙের পোষাক পরিধান করাই শ্রেয়। খুব রঙচঙে জেল্লাদার জামাকাপড় যেহেতু শোকের পরিমণ্ডলটি নষ্ট করতে পারে তাই ঐ জাতীয় পোষাক বর্জন করাই উচিত। লৌকিক জীবনে মানুষের যেমন উচিত-অনুচিতের জ্ঞান থাকে ঠিক তেমনি অলৌকিক কাব্য জগতের স্রষ্টা কবিদেরও এই জ্ঞানটুকু না থাকলে কাব্যরচনা ব্যর্থ হতে পারে। অর্থাৎ কোন্ কাব্যে কোন্ চরিত্র সৃজন করলে, কোন্ চরিত্রের মুখে কি জাতীয় সংলাপ বসালে এবং সেই চরিত্রের কি জাতীয় আচরণ দেখালে তা ঔচিত্যের হানি ঘটাবে না বা অসংগত হবে না কবির সেই বোধটুকু থাকা চাই। কেবলমাত্র চরিত্র বা আচরণের ক্ষেত্রেই নয় পদ, বাক্য, অর্থ, গুণ, অলংকার, ক্রিয়া, দেশ, প্রতিভা, কারক, লিঙ্গ, বচন, উপসর্গ, কাল প্রভৃতির ঔচিত্য রক্ষিত হয়েছে কিনা তা দেখাও কবির কর্তব্য।

একাদশ শতকের কাশ্মীরি আলংকারিক আচার্য ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবাদকে কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'ঔচিত্যবিচারচর্চা' গ্রন্থে তিনি রসকে প্রধান স্থান না দিয়ে ঔচিত্যকে প্রধান স্থান দেন। তিনি বলেছিলেন যে, লোকে রসকে কাব্যের আত্মা বললেও ঔচিত্যই হল সেই রসের প্রাণ। ক্ষেমেন্দ্র অলংকার, গুণ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে ঔচিত্যকে কাব্যের জীবন-স্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ঔচিত্যের অর্থ হল সদৃশতা বা সামঞ্জস্য। অর্থাৎ যার সঙ্গে যার মেলে বা খাপ খায় তাকে ঔচিত্য বলে। যেমন যে পদ যেখানে প্রয়োগ করলে সমগ্র অর্থের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য দেখা দেবে সেখানে সেই পদই প্রয়োগ করা দরকার। অলঙ্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, উচিত স্থানে বিন্যাস করলেই অলঙ্কার দেহকে অলঙ্কৃত করতে পারে। এবং উচিত স্থান থেকে বিচ্যুত গুণগুলিকেও গুণ বলা যায় না। কণ্ঠে মেখলা বা কোমরবন্ধন পরলে এবং নিতম্বে হার পরলে সেই অলংকারের কোনো মর্যাদা থাকে না। বীরত্ব একটি গুণ হলেও ভীত ব্যক্তির মধ্যে সেই গুণের প্রকাশ ঘটানো হাস্যকর। তেমনিভাবে কোনো নাট্যকার যদি প্রবল পরাক্রান্ত কোনো রাজার চিত্র অঙ্কন করেন তবে তিনি তাঁর এমন কোনো আচরণ দেখাবেন না যেটা অসংগত ও অসম্ভব। যেমন যদি নাট্যকার দেখান রাজা যুদ্ধে গিয়ে বিপক্ষ সৈন্য দলের

Scanned with CamScanner

সাতটা হাতিকে একা পাঁজাকোলা করে তুলে সাত হাত দূরে ছুঁড়ে ফেললেন,তবে সেই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে ও ঔচিত্যের সীমা পেরিয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার যে রাজা যত পরাক্রমী বীরই হোন না কেন তিনি মানুষ। তাঁর পক্ষে ঐ জাতীয় অমানুষিক আচরণ সম্ভব নয়। আবার মহাকবি কালিদাস যখন 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে হরপার্বতীর শৃঙ্গারের বর্ণনা করেছেন তখন তা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়নি। কারণ গ্রাম্য শৃঙ্গাররসের পরিবেশন দেবদেবীর শৃঙ্গার বর্ণনার ঔচিত্য হানি ঘটাতো। কালিদাস মহৎ কবি ছিলেন বলেই তাঁর কাব্যে ঔচিত্যের হানি ঘটেনি।

উন্নত চরিত্রে যেমন পাণ্ডিত্য শোভা পায়, তেমনি কোনো মহাকাব্যের মধ্যে বাক্যগুলি যদি এমনভাবে রচিত হয় যাতে বর্ণনীয় বিষয়টি সমুচিত ভাবে নিজেকে সপ্রমাণ করে তোলে বা প্রাণময় হয়ে ওঠে তাহলে তাকে বাক্যের ঔচিত্য বলা যেতে পারে। যথোপযুক্ত বিশেষণ দিলে প্রবন্ধের ঔচিত্য সাধিত হয়। যেমন যক্ষ যখন মেঘকে প্রিয়ার কাছে দূত করে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন তখন তিনি তাকে নানা বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র বলেছিলেন, কাব্যের মধ্যে রসের উপযুক্ত বাক্যবিন্যাস হলে তাকে গুণৌচিত্য বলে। রসের অনুকূল কিংবা অর্থের অনুকূল পদের ব্যবহারকে অলঙ্কারৌচিত্য বলে। ক্ষেমেন্দ্র কোন্ রসের সঙ্গে কোন রসের মিলনে রসৌচিত্য হয় তারও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন কোন রসের সঙ্গে কোন রসের মিলন সম্ভবপর। ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্য বিষয়ক আলোচনায় কারকৌচিত্য, লিঙ্গৌচিত্য, বচনৌচিত্য, বিশেষণৌচিত্য, উপসর্গৌচিত্য, নিপাতৌচিত্য, কালৌচিত্য, দেশৌচিত্য, কুলৌচিত্য, ব্রতৌচিত্য, তত্ত্বৌচিত্য, অভিপ্রায়ৌচিত্য, স্বভাবৌচিত্য, সারসংগ্রহৌচিত্য, প্রতিভৌচিত্য, অবস্থৌচিত্য নামৌচিত্য প্রভৃতি ঠাঁই পেয়েছিলো। ঔচিত্যই যে কাব্যের প্রাণ ক্ষেমেন্দ্র তা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন।

কুন্তকও ঔচিত্য বিষয়ে কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে উত্তম কাব্যের দুটি গুণ থাকা আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। এই দুটি হ'ল ঔচিত্য ও সৌভাগ্য। যেখানে বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপটি কবির পরিকল্পনার দ্বারা বা কবি-পরিকল্পিত বক্তা বা শ্রোতার স্বভাবের দ্বারা একটি নতুন মাহাত্ম্যে বা উৎকর্ষে মণ্ডিত হয় সেখানে ঔচিত্য হয়। কুন্তক ঔচিত্য বোঝাতে গিয়ে 'রঘুবংশম্' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র তিষ্ঠন্
আভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ
আরণ্যকোপাত্তফল প্রসূতিঃ
স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ"

এর বঙ্গানুবাদ

"যোগ্য পাত্রে করি দান বিভব তোমার,
হে রাজন্, আজি তুমি দেহমাত্র সার।
নীবার স্তবক হতে ধান্যের সম্ভার
বনবাসী নিলে যথা বৃন্ত শোভে তার।"

Scanned with CamScanner

রঘুবংশের এই শ্লোকে মুনি নিজের চরিত্রানুগভাবে ও নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজাকে বর্ণনা করেছেন। নীবার তৃণধান্য যেমন তার সমস্ত ধান অপরকে বিলিয়ে দিয়ে নিজের বৃন্তটি নিয়ে শোভা পায়, তেমনি নরশ্রেষ্ঠ রাজা তার সমস্ত ধন সৎপাত্রে দান করে কেবল দেহখানি নিয়ে শোভা পাচ্ছেন। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুনি তার অভিজ্ঞতার পরিধি থেকে রাজাকে বর্ণনা করেছেন। মুনি রাজাকে এমন কিছুর সঙ্গে তুলনা করেননি যে অভিজ্ঞতার শরিক মুনি নন। এমনটা হলে ঔচিত্য দোষ ঘটতে পারতো। এই যে দেশ, কাল, বক্তা, শ্রোতা প্রভৃতির অনুরূপভাবে বিষয়বস্তুকে দেখা, কুন্তক একেই ঔচিত্য বলেছেন।

আলংকারিক মহিমভট্ট ঔচিত্যকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—শব্দৌচিত্য এবং অর্থৌচিত্য। বিভাব, অনুভাব, ভাব যদি রসের আনুকূল্য না করে তাহলে সেখানে অন্তরঙ্গ বা অর্থানৌচিত্য হয়। আর শব্দবিন্যাসের অপটুত্ব বা ত্রুটি জনিত কারণে রসের অভিব্যক্তিতে ব্যাঘাত ঘটলে বহিরঙ্গ বা শব্দানৌচিত্য হয়। মহিমভট্ট অনৌচিত্যকে কাব্যের দোষ বলে স্বীকার করেছেন; কিন্তু আনন্দবর্ধন অনৌচিত্য মাত্রই রসপ্রতীতির ব্যাঘাত, এ কথা মানতে রাজি ছিলেন না। আনন্দবর্ধনের আলোচনায় কেবল অন্তরঙ্গ বা অর্থানৌচিত্যই গুরুত্ব পেয়েছিল কিন্তু মহিমভট্ট অনৌচিত্য বলতে রসপ্রতীতির ব্যাঘাত ছাড়াও শব্দ ব্যাপার জনিত দোষকে বুঝেছিলেন। মহিমভট্টের আলোচনায় শব্দানৌচিত্যই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। শব্দানৌচিত্য বলা হল এই কারণে যে মহিমভট্ট ঔচিত্যকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও আলোচনার সময় ঔচিত্য অপেক্ষা অনৌচিত্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আনন্দবর্ধন অর্থৌচিত্যের বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন বলে মহিমভট্ট তার আর পুনরাবৃত্তি করেননি।

আলংকারিক ভোজ তাঁর 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' এ ঔচিত্য সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন। ভোজ ঔচিত্যের আলোচনাকে রীতি ও ভাষার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। তিনি ছয় প্রকারের ঔচিত্যের কথা বলেছিলেন—বিষয়ৌচিত্য, বাচ্যৌচিত্য, দেশৌচিত্য, সময়ৌচিত্য, বক্তৃবিষয়ৌচিত্য ও অর্থৌচিত্য। ভোজের ঔচিত্য বিষয়ক আলোচনায় বেশ অভিনবত্ব আছে। যেমন বাচ্যৌচিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহারের ঔচিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া দেশ অনুসারে ভাষার পার্থক্য, সময়ানুযায়ী ভাষার ব্যবহার, বক্তার মান ও স্তর অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার ও বিষয় অনুযায়ী গদ্য ও পদ্যের ব্যবহার ভোজের ঔচিত্য-বিষয়ক আলোচনায় ব্যাখ্যাত হয়েছিল। তবে ভোজ ঔচিত্যকে কখনই কাব্যাত্মা বলেননি।

'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থের রচয়িতা হেমচন্দ্রও ঔচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। দোষ এবং গুণের অঙ্গীভূত করে ঔচিত্যের আলোচনা করার জন্যে তাঁর আলোচনায় ঔচিত্যের প্রাধান্য অনেকটা খর্ব হয়েছে। তিনি বক্তা, বিষয় ও রচনা—এই তিনের মধ্যে ঔচিত্যের অনুসন্ধান করেছেন।

আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত ঔচিত্য, অনৌচিত্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। আনন্দবর্ধন রসসৃষ্টির দিক থেকে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের কোনো কারণ নেই।' অর্থাৎ যে রচনায় ঔচিত্য রক্ষিত হয়

Scanned with CamScanner

সেই রচনা রসসৃষ্টিরও সহায়ক হয়। অনৌচিত্যই একমাত্র রসের অপরিপোষকতা করে। আনন্দবর্ধন কবিকর্ম বলতে কাব্যে রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে ঔচিত্য অনুযায়ী বাচ্য ও বাচকের (শব্দ ও অর্থের) যোজনাকে বুঝেছিলেন। কাব্যে শব্দ, অর্থ, রীতি,অলংকার গুণ এ সবকিছু বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হল এরা রসসৃষ্টিতে কতটা সহায়ক হয়েছে। এই ঔচিত্যতত্ত্বই হল রসতত্ত্বের পরম উপনিষৎ। ঔচিত্যের আলোকে অর্থ, রীতি, অলংকার, গুণ ইত্যাদি সবকিছুই বিচার্য কারণ এগুলি শেষ পর্যন্ত রসসৃষ্টিরই আনুকূল্য করে। অনুরূপভাবে বিচার্য কাব্যে চিত্রিত চরিত্রগুলি। চরিত্রানুযায়ী তাদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে না পারলে ঔচিত্যের ব্যাঘাত ঘটে। তাই কোনো মহৎ চরিত্রে কোনো নীচভাবের আরোপ প্রত্যাশিত নয়। দেবদেবীর সম্ভোগ বর্ণনায় গ্রাম্য শৃঙ্গারের আরোপ রসভঙ্গ ঘটাতে পারে। একটি রসের বর্ণনা করতে গিয়ে বিরুদ্ধরসের বর্ণনা প্রত্যাশিত নয়। একই বিষয়ের আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঔচিত্যহানি ঘটিয়ে রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। আকস্মিক ভাবে কোনো রসের বর্ণনা কিংবা প্রত্যাশিত বর্ণনীয় বিষয় হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া এসবই রসভঙ্গ করে বলে সবই ঔচিত্য বিরোধী কাজ। আনন্দবর্ধনের কাছে কোনো রচনার রসস্ফূর্তি হয়েছে না রসভঙ্গ হয়েছে—তা বিচারের একমাত্র মানদণ্ড রচনাটিতে সর্ববিষয়ে ঔচিত্য রক্ষিত হয়েছে কিনা। এইভাবে আমরা দেখি আনন্দবর্ধনের ঔচিত্য বিষয়ক আলোচনা মানেই রসের সার্থকতা-অসার্থকতা বিষয়ক আলোচনা। তাই 'অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের কোনো কারণ নেই'—মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

আমরা ঔচিত্য বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা করলেও মনে রাখা দরকার যে কোনো কবি বা সাহিত্যিক ঔচিত্যের পাঠ নিয়ে কাব্য-রচনায় অবতীর্ণ হন না। কবিতা হল বলিষ্ঠ অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কবিপ্রতিভা যাঁর আছে তিনিই পারেন এই অনুভূতিকে প্রকাশ করতে। কাব্যিক অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য কবিকে যেমন পৃথকভাবে যত্নশীল হতে হয় না, ঠিক তেমনি কোন্ জাতীয় রচনায় কি জাতীয় শব্দ ও অলঙ্কার ব্যবহৃত হবে, কোন্ রীতিতে লিখলে রচনা সার্থক হবে, চরিত্রে কোন্ স্বভাব যুক্ত হলে চরিত্রটি রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাবে না, বিষয়ের উপযোগী ভাষা কি হবে, সময়োপযোগী কোন্ ভাষা ব্যবহার করলে রচনা সার্থক হবে এ সব ঔচিত্যের বোধ প্রতিভাধর কবির মধ্যে আপনা-আপনি এসে পড়ে। তাই যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবির রচনাই রসের পরিপোষক হয়। ঔচিত্যের প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ও সচেতন থেকে কতটা সার্থক কবিতা রচিত হতে পারে সে প্রশ্ন তাই থেকেই যায়। ঔচিত্যের প্রতি পৃথকভাবে যত্নশীল হতে হয় না; ঔচিত্যবোধ শ্রেষ্ঠ কবির স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম। এই ধর্মই কাব্যের রসসৃষ্টির সহায়ক।

● সিদ্ধরস

সিদ্ধরসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত বলেছিলেন, "সিদ্ধ আস্বাদমাত্রশেষো ন তু ভাবনীয় রসো যেষু।" অর্থাৎ যে কথাবস্তু আস্বাদমাত্রই পরিণত হয়ে থাকে, রস যেখানে বিভাবিত করতে হয় না, তাকেই সিদ্ধরস বলে। পৃথিবীতে এমন অনেক বহুপ্রচলিত কাব্য আছে যা রসসৃষ্টির নির্দিষ্ট উপায়কে অতিক্রম করে পাঠকের মনে আস্বাদমাত্রই পরিণতি লাভ করে, এগুলিকে সিদ্ধরসের কাব্য বলে। এ জাতীয় কাব্য লোকসমাজে অতিপ্রচলিত

Scanned with CamScanner

হওয়ার জন্যে এর রসের আস্বাদ পাঠকের মনে কথাবস্তু নিরপেক্ষভাবে লেগে থাকে। পাঠকের মনের রসের তারে এগুলি এত গভীরভাবে ঘা দেয় যে এর বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও বেসুরো লাগে। এরকম বেসুরো কিছু হলেই সেখানে রসভঙ্গ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেমন রামায়ণ কাব্য। এই কাব্য ভারতবাসীর কাছে এতই প্রচলিত ও জনপ্রিয় যে এখানে এমন কোনো কল্পনা কবি যোগ করতে পারেন না যা এর রসের বিরোধিতা করে। আমাদের কাছে কথাবস্তু নিরপেক্ষভাবেই রামায়ণের রস আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। তাই এর বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও আমরা মেনে নিতে পারি না। এই কারণেই মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে অনেকে সিদ্ধরসের বিরোধী বলেছেন। যদিও 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর ঔচিত্যবোধকে ঠিক অভিনবগুপ্তের নিয়মে বিচার করা যায় না। কারণ সম্পূর্ণ নতুন যুগভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে মধুসূদন এ কাব্য রচনা করেছিলেন। মধুসূদনের কাব্য রাম-রাবণের কাহিনী হলেও ঊনবিংশ শতকের অভিনব সৃষ্টি। তাই এ কাব্য যে সিদ্ধরসের বিরোধী এমন কোনো সিদ্ধান্ত না করাই সমীচীন। অনেক গোঁড়া সমালোচক 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করে হিন্দুর ধর্মবোধে আঘাত লাগে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু কাব্যের বিচার ধর্মের বিচার নয়। রসসৃষ্টির সার্থকতার ওপরে কাব্যের সাফল্য নির্ভর করে। মধুসূদনের কাব্যের যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন তা যে রসিক-সমাজে গৃহীত হয়েছে তা বলা বাহুল্য মাত্র। মধুসূদন যেভাবে রামায়ণের চরিত্রগুলিকে অভিনব করে তুলেছিলেন তাতে কোনোভাবেই তা কাব্যকলার নিয়মভঙ্গ করেনি। এই কাব্য পাঠ করে পাঠক-পাঠিকা কখনই পীড়াবোধ করে না। মূল রামায়ণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে গিয়েই সমালোচকরা ভুল করে বসেন এবং কাব্যটিকে সিদ্ধরসের বিরোধী বলেন।

Scanned with CamScanner

সাধারণ অর্থে বক্রোক্তি বলতে 'বাঁকা কথা'কে বোঝানো হয়ে থাকে। সংস্কৃত ও বাংলা অলংকার গ্রন্থে 'বক্রোক্তি'কে শব্দালংকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অলংকারটি আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কাকু ও শ্লেষ। উচ্চারণ বা কণ্ঠস্বরের ভঙ্গির ওপর নির্ভর করে কাকুবক্রোক্তি অলংকার হয় এবং শ্লেষ বক্রোক্তিতে বাহ্য অর্থ ছাড়াও অন্য একটি অর্থ থাকে। সংস্কৃত আলংঙ্কারিক মম্মট ও রুদ্রট বক্রোক্তিকে শব্দালংকার হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভামহ, দণ্ডী ও বামন শব্দালংকার থেকে বক্রোক্তিকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। বক্রোক্তিবাদের সর্বময় প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল কুন্তকের হাতে; কিন্তু তাঁর আলোচনা পূর্বসূরীদের আলোচনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

দণ্ডী 'বক্রোক্তি' কথাটির দ্বারা 'স্বভাবোক্তি' থেকে যাবতীয় অলংকারের পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। তিনি সব অলংকারকেই বক্রোক্তি বলতে চেয়েছেন। দণ্ডী 'স্বভাবোক্তি' কে প্রথম কাব্যালঙ্কার বা 'আদ্যা অলংকৃতিঃ' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি পৃথক পৃথকভাবে একাধিক অলংকারের আলোচনা করলেও উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অবয়ব, অনন্বয়, সসংদেহকে পৃথক অলংকারের মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর কাছে 'শ্লেষ' হল সমস্ত অলংকারের চমৎকারিত্ব বিধায়ক। দণ্ডী বাঙ্ময় কাব্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। তিনি মনে করতেন বক্রোক্তির সৌন্দর্য নির্ভর করে শ্লেষের ওপর।

আচার্য ভামহও প্রচলিত অর্থে 'বক্রোক্তি' কথাটিকে গ্রহণ করেননি। তিনি শব্দার্থের মিলনকে সাহিত্য বললেও সেই মিলনের বক্রতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ শব্দার্থময় সাহিত্যে শব্দ ও অর্থের যে মিলন ঘটে তা হয় বক্র। তিনি 'বক্র' বলতে 'আরও কিছু'কে বুঝেছিলেন। সাধারণভাবে শব্দার্থ থেকে যা বোঝা যায় বক্রমিলনে তার থেকে আর একটু বেশি বোঝানোই কবিদের উদ্দেশ্য থাকে। একমাত্র বক্রোক্তিই পারে সেই আরও কিছুর ইঙ্গিত দিতে। ভামহ মনে করতেন, অলঙ্কার মাত্রই বক্রোক্তি। নাটক, মহাকাব্য, কথা, আখ্যায়িকা সর্বত্রই বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বক্রোক্তিকে 'লোকাতিক্রান্ত গোচরং বচঃ' বলেছিলেন। 'লোকাতিক্রান্ত' বলতে তিনি দৈনন্দিন ভাষা থেকে পৃথক অন্যজাতের ভাষাকে বুঝিয়েছিলেন। তিনি সব অলংকারের মধ্যেই একটি অতিশয়োক্তির ভাব লক্ষ্য করে বক্রোক্তিকে অতিশয়োক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—"সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তি।" আর 'সৈষা' বলতে অতিশয়োক্তিকে বুঝিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভামহের মতে সব অলংকারই এক হিসাবে অতিশয়োক্তি ও বক্রোক্তি। সুতরাং ভামহের বক্রোক্তি বিষয়ক আলোচনায় দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ তিনি বক্রোক্তিকে মম্মট বা রুদ্রটের মত নিছক শব্দালংকার হিসাবে মেনে নেননি এবং দ্বিতীয়তঃ বক্রোক্তির মধ্যে তিনি লোকোত্তর বিষয়ের ইঙ্গিত করেছিলেন।

আচার্য বামনও বক্রোক্তিকে শব্দালংকার বলতে চাননি। তিনি বক্রোক্তিকে লক্ষণার দ্বারা রচিত ভিত্তি অলংকার বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এই অর্থালঙ্কারে সাদৃশ্যের সাহায্যে লক্ষণার ভিত্তি রচিত হয় বলে মনে করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থে যে বক্রোক্তিতত্ত্ব খাড়া করেছেন তার অনেকটাই ভামহের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কুন্তক শব্দ ও অর্থের মিলিত রূপকে সাহিত্য বলে গণ্য করলেও নিছক শব্দার্থের মিলনকে সাহিত্য বলেননি। শব্দ ও অর্থের মিলন যখন আহ্লাদজনক হয়ে ওঠে তখনই তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়। কাব্য ও সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুন্তক বলেছিলেন :

শব্দার্থৌ সহিত বক্রকবিব্যাপারশালিনি
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥

অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থ কাব্যরসিকদের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবি ব্যাপারপূর্ণ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হলেই কাব্য হয়ে থাকে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, এই কাব্য রসিকজনের "অদ্ভুতামোদ চমৎকার' বিধান করে। শব্দ হল বাচক এবং অর্থ তার বাচ্য। এদের মিলিত সত্তাকেই কাব্য বলে। কেবল শব্দও কাব্য নয়, আবার কেবল অর্থও কাব্য নয়। উভয়ের যুগপৎ মিলনেই কাব্য হয়। কুন্তক বলেছিলেন যে, প্রতিভার দারিদ্র্যের জন্য যাঁরা কেবলমাত্র শব্দমাধুর্য সৃষ্টি করতে চান তাঁরা কাব্যের যথার্থ সম্পদ প্রকাশ করতে পারেন না। আবার কেবলমাত্র অর্থ-চাতুর্যের দ্বারা শুষ্ক তর্কের গাঁথুনি গাঁথলেও কাব্য হয় না। প্রতিভার দ্বারা প্রথমে বর্ণনীয় বস্তুটি কবিচিত্তে মণিখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অস্ফুটভাবে যা মনের মধ্যে প্রতিভাত হয় তা যদি বক্রবাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় তা উজ্জ্বল হীরের মালার ন্যায় শোভা পায় ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করে এবং তখনই তা কাব্যত্ব লাভ করে। কুন্তক বলেছিলেন যে, একই কথা ভঙ্গিগত বিভিন্নতার কারণে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য কাব্যসম্পদের পার্থক্য রচনা করে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, কুন্তক শব্দ ও অর্থের মিলিতসত্তার চমৎকারিত্বের মধ্যে যে কাব্যত্ব অন্বেষণ করেছেন তার প্রকৃত অর্থ কি? শব্দ ও অর্থ তো সর্বদা মিলিতই থাকে। বাচ্য ও বাচক, অর্থ ও শব্দের কোনোখানেই তো মিলিতসত্তার অভাব নেই। তবে এদের মিলনে কাব্য হয় একথা বলার অর্থ কি? এর উত্তরে কুন্তক বলেছেন যে কাব্য হতে গেলে শব্দার্থের মিলিতসত্তার একটি বিশিষ্টতা আবশ্যক। যাকে শব্দার্থের 'সাম্যসুভগ' অবস্থান বলা চলে। এই মিলন হবে ন্যূনতা এবং বাহুল্যবর্জিত মনোহারী মিলন। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ কেউ কারও চেয়ে ছোট বা নিকৃষ্ট হবে না,আবার বড় বা উৎকৃষ্টও হবে না। তারা হবে পরস্পর স্পর্ধিত রমণীয়—পরস্পরকে স্পর্ধা করে সমানভাবে বড় হয়ে উঠে পরস্পরের সংযোগে তারা রমনীয় হয়ে উঠবে। এই পরস্পর স্পর্ধা প্রতিযোগিতামূলক হলেও শত্রুভাবাপন্ন নয়, মিত্রভাবাপন্ন। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে থাকবে একটা সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। একে অনেকটা তুলনা করা যেতে পারে মাঠের দুটি বড় তালগাছের সঙ্গে। উদ্ভিদবিদ্‌রা বলেন যে মানুষের মত গাছের মধ্যেও বড় হওয়ার প্রতিযোগিতা চলে। এর ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো বড় গাছ উভয়ে উভয়কে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতার নামে, কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো অসুস্থতা থাকে না। একটা গাছ আর একটা গাছকে ঠেলে ফেলে দিয়ে কখনই বড় হয় না। অনুরূপভাবে শব্দ ও অর্থও পরস্পরকে স্পর্ধা করে বড় হয়ে উঠলেও তাদের মধ্যে থাকে সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের ফলেই কাব্য রমণীয় হয়ে ওঠে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের বিশিষ্টতা অর্থাৎ সৌকুমার্য ও সূক্ষ্মতা

Scanned with CamScanner

না থাকলে কাব্য হয় না। কাব্যশিল্পের জন্যে চাই একদিকে পরস্পর অর্থের সামঞ্জস্যে ক্রমবিকাশ এবং অন্যদিকে সেই অর্থের সামঞ্জস্যে শব্দের মিলন। অর্থাৎ কাব্য রচনার সময় দেখা দরকার শব্দগুলি অর্থের আনুকূল্য করেছে কিনা বা শব্দগুলির বিন্যাসে অর্থধারা কলুষিত হয়েছে কিনা। পরস্পর প্রতিস্পর্ধীভাবগুলি কিভাবে একটি অখণ্ড অর্থসম্পদ ফুটিয়ে তুলে যথার্থ কাব্য হয়ে ওঠে তার প্রমাণ দিয়েছেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'মালতীমাধব' এর একটি শ্লোক উদ্ধার করে। কোনও কাপালিক কোনও সুন্দরী নায়িকাকে বধ করতে উদ্যত হলে কোনো ব্যক্তি নায়িকার অসাধারণ লাবণ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন:

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনং।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্মাণমফলং
জগজ্জীর্নারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

এই শ্লোকে নায়িকা নিহত হলে সংসারের কি ক্ষতি হবে তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি চিত্তে এক একটি কথা মনে হয়েছে এবং পরক্ষণেই মনে হয়েছে ঐটুকুই যেন যথেষ্ট নয়। এই অভাববোধ থেকে তাঁর মনের মধ্যে আবার নতুন ভাবের উদয় হয়েছে এবং পরস্পর স্পর্ধিত ভাবগুলি কাব্যের অখণ্ড অর্থসম্পদ গড়ে তুলেছে। প্রথমে কবির মনে হয়েছে, নায়িকা নিহত হলে সংসার অসার হবে, কিন্তু এতে কবির মনোবেদনা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি জেনেই তিনি আবার বলছেন, সমস্ত ত্রিভুবনের একমাত্র রত্ন অপহৃত হবে, পৃথিবীর আলো নিভে যাবে, মানুষের চক্ষুনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দূর হবে, জগৎ শুষ্ক অরণ্য হবে। এমনি করে এক একটি ভাবের পাঁপড়ি পরস্পর প্রতিযোগিতায় ফুটে উঠে একটি সমগ্র-ভাবকমল ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু যদি কবি এখানে একটি ভাবের দ্বারা চমৎকারিত্ব ফোটাতে চাইতেন তবে তা এতো সুন্দর হত না। এখানে অনেকগুলি পরস্পর প্রতিস্পর্ধী ভাব বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে বড় হয়ে উঠেছে বলেই কাব্যটি রমণীয় হয়েছে।

কুন্তক বক্রোক্তি বিষয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সেখানে বাইরের জগৎ বা বস্তু জগৎ উপেক্ষিত হয়নি। কাব্য রচনার সময় এই জগৎ কবিচিত্তে ঠাঁই পায় এবং তাঁর অন্তরে গভীর আলোড়ন জাগায়। এই আলোড়নের ফলে বাহ্যজগৎটি কবির মনে আর পূর্বাবস্থায় থাকে না। তা তাঁর অন্তর্লোকে ভাবময় অলৌকিক রূপ পরিগ্রহ করে। এমতাবস্থায় অন্তরের পরিস্পন্দনে বা আলোড়নে কবি এমন সমস্ত শব্দ নির্বাচন করেন যা ভাবময় বস্তুটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ কবির মনের মধ্যে বাইরের বিষয়বস্তুজাত যে নবীন ভাবময় দেহখানি ফুটে ওঠে তাই যেন স্বমহিমায় শব্দরূপে অবতীর্ণ হয়। অলৌকিক ব্যাপার-মাহাত্ম্যে জাগতিক বস্তু যেমন কবিচিত্তে ভাবময় হয় তেমনি যথোপযুক্ত শব্দ নির্বাচন, সঞ্চয়ন ও বিন্যাস সেই অলৌকিক ব্যাপারেরই ফল। কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি হল প্রথমতঃ বাহ্যজগতের ভাবরূপ পরিগ্রহ এবং দ্বিতীয়তঃ পরিগৃহীত ভাবরূপটিকে যথাযথ শব্দরূপে পরিবর্তন। যে কোনো সার্থক সাহিত্যই এই ভাবরূপ ও শব্দরূপের যথাযথ মিলন।

এবারে একটু সহজ ভাবে কুন্তকের বক্তব্যকে বোঝা যেতে পারে। আমরা দেখেছি, বস্তুজগতের সঙ্গে ভাবময় জগতের একটা পার্থক্য আছে। তেমনি লোকমুখে ব্যবহৃত সাধারণ লৌকিক শব্দের সঙ্গে কবির অলৌকিক জগৎ অর্থাৎ কাব্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দেরও

Scanned with CamScanner

পার্থক্য আছে। ভাব যে রূপে, যে ভাবে কবির মনের মধ্যে ফুটে ওঠে ঠিক তার উপযোগী শব্দও তাঁর মনে জন্ম নেয়। ভাবোপযোগী শব্দ যদি স্ব-মহিমায় প্রকাশিত না হত তবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যাহত হত। শব্দ, ভাবের পরিপোষকতা না করলে সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। যথার্থ ভাবরূপের সঙ্গে যথার্থ শব্দরূপের মিলনেই সাহিত্য গড়ে ওঠে। সার্থক কবির কাছে দুটি একই প্রযত্নে জন্ম নেয়। এদের জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

অর্থ প্রসঙ্গে কুন্তক বলেছেন যে, বাইরের জগৎ নানারকম ভাবধর্মের দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে রচিত হতে পারে। কিন্তু যে ভাবধর্মের দ্বারা রচিত হলে অর্থাৎ যে বিশেষভাবরূপ পরিগ্রহ করলে তা সহৃদয়গণের আহ্লাদের কারণ হয় তাই কাব্যাকারে পরিণতি লাভ করে। অন্তরের আলোড়নজাত যে সমস্ত শব্দ কবি নির্বাচন করেন সেই শব্দগুলির অর্থই কবির অভিপ্রেত। এই জাতীয় শব্দ ও অর্থের মিলনে যে ভাব ধরা দেয় তা অলৌকিক। শব্দ ও অর্থের এই ধরনের মিলন, যা অন্যভাবে কাব্যের শৈল্পিক ধর্ম (Aesthetic quality) রূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে তাকেই কুন্তক 'বক্রতা' রূপে অভিহিত করেছেন।

কুন্তক কোনো বস্তুর স্বভাবমাত্র বর্ণনাকে অলঙ্কার বলতে চাননি। কেননা তিনি মনে করতেন, যাই বর্ণনা করা হোক না কেন তার স্বভাবটা সেখানে থাকবেই। সেই স্বভাবের অতিরিক্ত কোনো ভাবধর্ম যুক্ত না হলে কোনো অলংকার সৃষ্টি হতে পারে না। এইজন্যে কুন্তক দণ্ডীর স্বভাবোক্তি অলংকারকে বর্জন করেন। অভিনবগুপ্ত অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, যা রসের শোভাবৃদ্ধি না করে তা অলংকারই নয়। তাঁর মতে অলংকার হ'ল রসের 'শোভা-সম্পাদক ধর্ম।' কুন্তক রসের সঙ্গে না হলেও বক্রতার সঙ্গে অন্বিত করে অলংকারের বিচার করেছেন। প্রচলিত অলংকারগুলির কোনো মূল্যই থাকে না যদি না সেগুলি বক্রতার সঙ্গে অন্বিত হয়ে কাব্যশোভা বৃদ্ধি করে। বক্রতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হলেই প্রচলিত অলংকারগুলি যথার্থ স্থান লাভ করে; তখন তা বক্রোক্তিরই একটা স্তর হয়ে ওঠে। এইভাবে কুন্তক বক্রোক্তির মধ্যে প্রচলিত অলংকারগুলি অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

কুন্তক রীতির আলোচনা করতে গিয়ে বামনের তিনটি এবং দণ্ডীর দেওয়া দুটি রীতিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে দেশ-বিশেষে কোনো রীতির নামকরণ করা হতে পারে না। রীতির মধ্যে দিয়ে কবির স্বভাবটি যেহেতু ধরা পড়ে তাই তা দেশ-বিশেষের ধর্ম হতে পারে না। তিনি রীতির পরিবর্তে তিনটি 'মার্গ' এর কথা বলেছিলেন। এগুলি হল— সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যমমার্গ। এই মার্গগুলির মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ, বা কোন্‌টা নিকৃষ্ট এ প্রশ্ন অবান্তর। কবির স্বভাবজনিত কারণে লিখনপ্রণালীতেও অসংখ্য পার্থক্য থাকতে পারে। আমাদের শুধু দেখা কর্তব্য রচিত কাব্যটি রমণীয় হয়ে উঠেছে কিনা। তিনরীতির যে কোনো একটিতে সাহিত্য রচনা করেই অমর হওয়া সম্ভব।

গুণের আলোচনা করতে গিয়ে কুন্তক গুণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—সাধারণ ও অসাধারণ। সৌভাগ্য, ও ঔচিত্যকে তিনি বলেছেন সাধারণ গুণ এবং মাধুর্য, প্রসাদ,

Scanned with CamScanner

লাবণ্য ও আভিজাত্যকে বলেছেন অসাধারণ গুণ। যে কোনো উত্তমকাব্যে সৌভাগ্য ও ঔচিত্যগুণ থাকেই কিন্তু সুকুমার ও বিচিত্র মার্গের কাব্যে থাকে অসাধারণ গুণ। অসাধারণ গুণগুলির স্বভাব মার্গ অনুযায়ী ভিন্ন হয়। গুণের আলোচনা করতে গিয়ে কুন্তক অন্তত তিনটি গুণের কথা বলেছিলেন যা একেবারেই অভিনব। এগুলি হল লাবণ্য, আভিজাত্য ও সৌভাগ্য। কুন্তকের গুণের আলোচনাও তাঁর বক্রোক্তির আলোচনার মতই মৌলিকতায় ভাস্বর।

কুন্তক বক্রোক্তির আলোচনা অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে করেছিলেন। তিনি বক্রতার মধ্যে অলংকার, গুণ, রীতি এবং ধ্বনিকেও যুক্ত করে নিয়েছিলেন। আনন্দবর্ধন কবিপ্রতিভার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন ব্যঞ্জনাময়ধ্বনির মধ্যে, আর কুন্তক পেয়েছিলেন বক্রোক্তির মধ্যে। বক্রোক্তিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে ধ্বনির স্বাধীন অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিলেন—"The Vakroktijibit denies the independent existence of Dhavani...as the soul of the poetry and tries to include it under its all pervading Vakrokti.'' (History of Sanskrit Poetics, P.V. Kane). তিনি শব্দার্থের যে নিপুণ সূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে কাব্যব্যাপারকে অলৌকিক অভিধায় ভূষিত করেন সেই আলোচনার গভীরতা রীতিমত বিস্ময়কর। শব্দার্থের আলোচনার পাশাপাশি কুন্তক বাক্যগত, প্রকরণগত, প্রবন্ধগত সাহিত্যের কথাও বলেছিলেন। তিনি বক্রোক্তিকে যে ছয়টি শ্রেণীতে (বর্ণবিন্যাস-বক্রতা, পদপূর্বার্ধ-বক্রতা, পদপরার্ধ-বক্রতা, বাক্যবৈচিত্র্য বা বস্তু-বক্রতা, প্রকরণ-বক্রতা ও প্রবন্ধ-বক্রতা) বিভক্ত করেছিলেন সেগুলির মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। এর থেকেই বোঝা যায় কুন্তকের বক্রোক্তি-বিষয়ক আলোচনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা কতটা ছিল।

Scanned with CamScanner